এ তো মুখ নয় যেন...

‘তোর কথার কোনো ট্যাক্স নাই’ - যে কোন আড্ডার একটি প্রচলিত বাক্য। বন্ধুদের আড্ডায় যার যা ইচ্ছে সে তাই বলতে পারে। কিন্তু কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, প্রকাশ্যে কী যা ইচ্ছে তাই বলতে পারেন? প্রেক্ষাপট যদি বাংলাদেশ হয় তাহলে অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ। আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম রাজনীতিবিদ। এই রাজনীতিবিদ নামক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা প্রকাশ্যে জনসভায় যা ইচ্ছে তাই বলেন। নিজেরা যা বিশ্বাস করেন না সেকথা বলেন। নিজেরা যে কাজ করবেন না সে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। এক কথায় যাকে বলা যায় মিথ্যা কথা। মুখের কথা নিয়ে তারা মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চান...

লিখেছেন **মোহসিউল আদনান** ও **জয়ন্ত আচার্য**

সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে মিনু। হাসির গল্পের বই পড়া তার খুব শখ। বাবাকে বইয়ের জোগান দিতে হিমশিম খেতে হয়। যেদিন নতুন বই থাকে না, সেদিন নিজেকেই গল্প বলতে হয়। এমন একদিন বাবার দায়িত্ব পড়ল মেয়েকে গল্প বলার। গল্প শুরু করলেন বাবা।

বাবা : খালেদা জিয়া সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গড়ার কথা বলেছেন।

মেয়ে : এটা নয়, হাসির গল্প বলো।

বাবা : শেখ হাসিনাও সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গড়ার কথা বলেছেন।

মেয়ে : বাবা, এসব নয়, আমাকে হাসির গল্প শোনাও।

বাবা : খালেদা জিয়া যখন এ কথা বলেছেন তখন তার পাশে ছিল নাসির উদ্দিন পিন্টু। আর হাসিনা যখন কথা বলেছেন তখন তার পাশে ছিল হাজী সেলিম।

মেয়ে : পিন্টু, হাজী সেলিম– এরা কারা?

বাবা : পিন্টু ছাত্রদলের বড় নেতা। ছাত্রদলের আরেক নেতা লাল্টু কথা শোনেনি বলে সে বড় চাকু দিয়ে তার কান কেটে দিয়েছিল। এছাড়া আর্মির কাছে যেমন অস্ত্র থাকে সেরকম অনেক অস্ত্র আছে তার কাছে। আর হাজী সেলিমকে চেন না! তার একজন লোকের ছবি দেখনি পত্রিকায়! ঐ যে বড় একটি অস্ত্র যার নাম নাইন শ্যুটার

শটগান নিয়ে একজন লোক দৌড়াচ্ছিল রাস্তায়। হাজী সেলিম হচ্ছে তাদের লিডার। তার অনেক ক্ষমতা। সে নদীর ভেতরে, অন্যের জমিতে বড় বড় বিল্ডিং তুলতে পারে। অনেক অস্ত্রের মালিক সে।

মেয়ে : বাবা এরা তো খারাপ মানুষ। এরা তো সন্ত্রাসী।

বাবা : হ্যাঁ মা, আমাদের দুই নেত্রী বলেছেন তারা সন্ত্রাস নির্মূল করবেন।

মেয়ে : হাউ ফানি, বাবা!!

মেয়ে হাসতে থাকলো, এমন একটি হাসির গল্প বলতে পারার জন্য পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন বাবা।

এটা একটি গল্প। বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের বিষয় নয়। এটা বাংলাদেশের বাস্তবতা। বাংলাদেশে রাজনীতিবিদরা যেকোনো কথা বলতে পারেন। কারণ এর জন্য তাদের কোনোদিন জবাবদিহি করতে হয় না। মানুষ তাদের মুখের কথা শোনে এবং ভুলে যায়। পুরোপুরি যে ভুলে যায় সেটাও হয়ত বলা যায় না। কারণ মানুষ এসব চিহ্নিত রাজনীতিবিদ নামক সন্ত্রাসীদের ঠিক ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে। এজন্যই জনগণের ভোটে বিজয়ী হয়ে সংসদে আসে জয়নাল হাজারী, হাজী সেলিম বা সারোয়াররা। যে জাতীয় নেত্রীরা কথা দিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তারাই এদের বিজয়ী করে আনার ব্যবস্থা করেন। শেখ হাসিনা ইকবাল, হাজী সেলিমদের পাশে বসিয়ে সন্ত্রাসমুক্ত করার কথা বলেন। আর খালেদা জিয়া সন্ত্রাসমুক্ত করার কথা বলেন পিন্টু, সারোয়ার, ভিপি জয়নালদের পাশে বসিয়ে। পাঁচ বছরের মেয়ে মিনুর কাছে যা হয় হাসির গল্প।

ইকবালকে সঙ্গে নিয়ে কাওরানবাজারে যেদিন হাসিনা সন্ত্রাস নির্মূলের কথা ততদিনে হয়ত তিনি সেই মিছিলের কথা ভুলে গেছেন, বিস্মৃত হয়ে গেছেন পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিটির বিষয়ে। বিএনপি'র নেত্রী এলাকা-বাসীকে বলেছেন ভুল করে থাকলে পিন্টুকে বকে দিতে বলেছেন। তিনি হয়ত জানেন না পিন্টুকে বকার সাহস কারোরই নেই। ভুল করে কেউ যদি এই কাজ করতে যায় তার অবস্থা যে কান কাটা লাল্টুর মত হবে না তার নিশ্চয়তা কী। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা শাহাবুদ্দীন লাল্টুকেই পিন্টু মাফ করে না আর সাধারণ মানুষ কোন ছাড়।

নির্বাচনের আগে নেতা-নেত্রীদের মুখে থাকে শুধুই মধুর বাণী। এই করব, সেই করব বলতেই থাকেন তারা। দামি কাগজে লম্বা, চওড়া নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেন। নির্বাচন শেষে সবই হারিয়ে যায়। ভালো ভালো কথার প্রতিফলন ঘটে না কাজে কর্মে।

সবগুলো রাজনৈতিক দল এবার সন্ত্রাসকে নির্মূলের জন্য সর্বাধিক জোর দিয়েছে তাদের মেনিফেস্টোতে। আওয়ামী লীগ তাদের ইশতেহারে বলেছে, 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার পাশাপাশি দলমত নির্বিশেষে অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং চাঁদাবাজি, ছিনতাই, রাহাজানি ও নারী নির্যাতনসহ সব ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ড কঠোর হাতে দমন করা হবে।' প্রশ্ন হচ্ছে গত ৫ বছরে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের এই অবস্থান কোথায় ছিল। জননিরাপত্তা আইন বিরোধী দলকে শায়েস্তা করার জন্য এতটাই ব্যবহৃত হয়েছে যে, তা এখন আদালতের কাঠগড়ায় অকার্যকর হবার অপেক্ষায় রয়েছে। এবারও যে সততার সঙ্গে আওয়ামী লীগ এ কথা বলছে তা নয়। কেননা ফেনীতে জয়নাল হাজারীর মনোনয়ন সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে সন্ত্রাস নির্মূল শুধু মুখের কথা। শুধু জয়নাল হাজারীকে মনোনয়ন দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি আওয়ামী লীগ। ফেনীর আরেক আসনে তারা নিয়ে এসেছে আদি গডফাদার জাফর ইমামকে। ঢাকার হাজী সেলিম, মকবুল তো বহাল তবিয়তে নির্বাচন চালাচ্ছে। সন্ত্রাসীদের মনোনয়ন দেবার দৌড়ে বিএনপিও পিছিয়ে নেই। জয়নাল হাজারীকে ঠেকাতে তারা আশ্রয় নিচ্ছে আরেক সন্ত্রাসী ভিপি জয়নালের পদতলে। জাফর ইমামকে প্রতিহত করার নামে খালেদা জিয়ার ভাই সাইদ ইস্কান্দার প্রতিনিয়ত মহড়া দিচ্ছেন। বরিশালে আসন রক্ষায় গডফাদার সারোয়ারকে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য যা যা করণীয় তার সবই বিএনপি করছে। অথচ ইশতেহারে ভালো ভালো কথা তারাও বলছে সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য। দেশের জনগণের দুর্ভাগ্য এখানেই। তাদের ভোটে অবশেষে নির্বাচিত হবে কোনো না কোনো সন্ত্রাসী। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের জন্য কোনো বিকল্প পথ খোলা রাখেনি।

'বোমা হামলাকারীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। বোমা হামলা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে' এসব কথা যখন আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বলে তখন যে কোনো জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের জন্য তা হাসির খোরাক হয়। কেননা ক্ষমতায় থাকার সময়ে উদীচী ট্র্যাজেডির কোনো কূল কিনারা তারা করতে পারেনি। ধরতে পারেনি কোটালীপাড়ার ঘটনায় অভিযুক্ত মুফতি হান্নানকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এর জন্য কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অবশ্য মোহাম্মদ নাসিমকে ঘামতে ঘামতে তারস্বরে বক্তৃতা

এইচ.বি.এম. ইকবাল

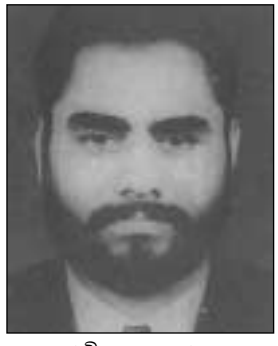
হাজী মকবুল হোসেন

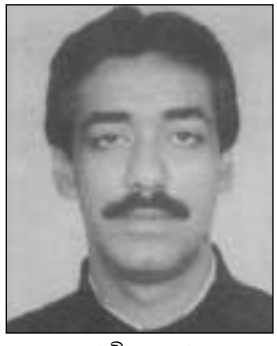
শামীম ওসমান

আবুল হাসনাত

জাফর ইমাম

হাজী সেলিম

জয়নাল হাজারী

এদের দিয়েই কি আওয়ামী লীগ সন্ত্রাস নির্মূল করবে ?

দিতে দেখা গেছে। যখনই বোমা বিস্ফোরণের কোনো ঘটনা ঘটেছে তখনই তিনি বলেছেন, 'আগামী ২৪ অথবা ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেয়া হবে'। অথচ সেই ব্যবস্থা যে কী তা এখন পর্যন্ত আমরা কেউই দেখতে পারিনি। শুধু বিশেষ ক্ষমতা আইন ও জননিরাপত্তা আইনে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিএনপি অবশ্য তাদের ইশতেহারে বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ এবং জননিরাপত্তা আইন ২০০০ বাতিল করার অঙ্গীকার করেছে। অবশ্য এই অঙ্গীকার ১৯৯১ সালেও বিএনপি করেছিল। ক্ষমতায় গিয়ে যথারীতি ভুলে গিয়েছিল তারা।

সন্ত্রাসের পরে যে বিষয়টি নিয়ে এখন রাজনৈতিক দলগুলো উচ্চবাচ্যে ব্যস্ত তা হচ্ছে দুর্নীতি। বিশ্বের দুর্নীতিবাজ দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের নাম শীর্ষে থাকা নিয়ে আওয়ামী লীগ কড়া প্রতিবাদ করলেও তাদের ইশতেহারে দুর্নীতির বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে 'দুর্নীতি নির্মূল এবং প্রতিরোধে আরও কার্যকর সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি স্বাধীন 'দুর্নীতি দমন কাউন্সিল' গঠন করা হবে'। বিএনপি দুর্নীতি দমন কমিশন নামে স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করার অঙ্গীকার করেছে। '৯৬ সালে ক্ষমতায় যাওয়ার সময় আওয়ামী লীগ বলেছিল তারা মন্ত্রীদের সম্পত্তি হিসাব প্রকাশ করবে। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে সেসব ভুলে গেছে। এবারের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার দিনে সাংবাদিকদের এ বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে শেখ হাসিনা বলেছেন, 'এসব (মন্ত্রীদের সম্পত্তি) প্রকাশ করার বিষয় নয়। হিসাব আমার কাছে আছে, থাকবে।' কেননা তিনি জানেন তার মন্ত্রীদের বৈধ হিসাব আর সত্যিকার হিসাবের পার্থক্য এত বেশি যে, তা সাধারণ মানুষের ধারণ ক্ষমতার বাইরে।

ন্যায়পাল নিয়োগের বিষয়েও তারা প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। এরশাদ আর চরমোনাইয়ের পীরের ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নির্বাচনী ইশতেহারে জাতীয় গজব বলে আখ্যায়িত করেছে জামায়াতে ইসলামী, ১১ দলও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে বলে জানিয়েছে। অথচ এরশাদ ক্ষমতায় থাকার সময়ে দুর্নীতিকে রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। দুর্নীতির কারণেই তিনি এবার নির্বাচনে অংশ নিতে পারছেন না। খালেদা জিয়ার সময়ে মন্ত্রী মাজেদ উল হকের বিরুদ্ধে সার কেলেঙ্কারির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকার পরও বিএনপি কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বরং যে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয় তাদের বিরুদ্ধেই বিএনপি সরকার তখন সোচ্চার হয়ে ওঠে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিএনপি মন্ত্রিসভার কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলাও করে। আওয়ামী লীগ সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর অনিয়মের বিষয়েও এখন

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

নাসিরউদ্দিন পিন্টু

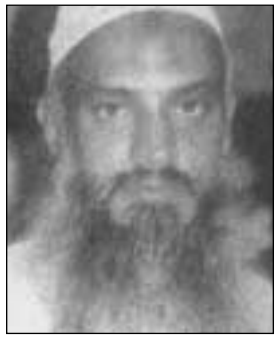
মোফাজ্জেল হোসেন কায়কোবাদ

মির্জা আব্বাস

গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী

মজিবুর রহমান সরোয়ার

এদের দিয়েই কি বিএনপি সন্ত্রাস নির্মূল করবে

মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে দুর্নীতি দমন ব্যুরো। ক্ষমতায় থাকাকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমের স্ত্রীর একটি দুর্নীতির সংবাদ ছাপা হয়েছিল একটি পত্রিকায়। আওয়ামী লীগ সরকার দুর্নীতির বিষয়টি তদন্ত করেনি। উল্টো মোঃ নাসিম বলেছিলেন, 'কুত্তার বাচ্চা সাংবাদিককে আমি দেখে নেব।'

রাজনৈতিক দলগুলো কখনোই তাদের দুর্নীতিবাজ নেতাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় না। বরং ক্ষমতায় থাকার সময়ে দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে প্রভাব খাটিয়ে তাদেরকে নিবৃত্ত করা হয়। এবারের মনোনয়ন তালিকায় কোটিপতি, ঋণখেলাপি, বিল খেলাপির নাম দেখলে বোঝা যায় বিএনপি, আওয়ামী লীগ বা অন্যান্য দলগুলো কতটুকু দুর্নীতিমুক্ত দেশ তৈরি করতে পারবে। সালমান এফ রহমান, নূর আলী, এমএ হাশেম কোটি টাকা দিয়ে মনোনয়ন কিনে কোটি কোটি টাকা হাওয়ায় উড়াচ্ছে কোনো কারণ ছাড়া এমন ভাবলে ভুল হবে। তারা দশ কোটি টাকা খরচ করলে মনে রাখতে হবে নির্বাচিত হয়ে এরা সুদে আসলে কয়েকগুণ টাকা তুলে নেবে। এত অল্প সময়ে এত টাকা নিঃসন্দেহে আইন সম্মতভাবে হবে না। রাজনীতিতে কালো টাকার প্রভাব এখন এতটাই শক্তিশালী যে রাজনৈতিক দলগুলো ভবিষ্যতে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকবে তা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায়। দু'একজন সৎ রাজনীতিবিদ কষ্ট করে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তবে দুর্নীতির প্রক্রিয়ায় জড়িত বড় বড় দলগুলো আর যাই পারুক না কেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারবে না। এ বিষয়টি জনগণও মেনে নিয়েছে। তাই দুর্নীতি দমনের বিষয়ে রাজনীতিবিদদের সব কথাই 'নির্বাচনী প্রলাপ' হিসেবে ধরে নেয়া যায়।

এরকম প্রলাপের আরেকটি হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ। একুশে টেলিভিশনের সঙ্গে নির্বাচনী সংলাপে সাইফুর রহমান বলেছেন, 'এই কাজ আমরা করতে চেয়েছি ক্ষমতায় যাওয়ার আগে আওয়ামী লীগও চেয়েছিল। কিন্তু কেউই করিনি। এখন আমরা প্রত্যেকটি দলই চাচ্ছি কাজটি করতে।' সাইফুর রহমান এই উত্তর দেন যখন তাকে প্রশ্ন করা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের যে উদ্যোগ নিয়েছে তা তিনি সমর্থন করেন কী না। সাইফুর রহমান অবশ্য পরিষ্কার করে সমর্থন জানিয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই উদ্যোগের বিষয়ে। স্পষ্টভাষী এই নেতা জানেন রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে পারদর্শী। তাই তাদের ওপর ভরসা করে বসে থাকার চেয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে এমন আশা করা অনেক শ্রেয়।

বিচার বিভাগের মত আরেকটি বিষয়

নির্বাচনী ইশতেহারের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা

বিভিন্ন দলের বক্তব্য

সন্ত্রাস

আওয়ামী লীগ : দলমত নির্বিশেষে অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।

বিএনপি : সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, ধর্ষণের মত অপরাধ দমন করে দেশকে বাসযোগ্য করে তোলা হবে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করা হবে।

ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট : সন্ত্রাস দুর্নীতি একটি জাতীয় গজব। এ গজব থেকে বাঁচার জন্য সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়া হবে।

জামায়াতে ইসলামী : সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, রাহাজানি, চোরাচালানসহ সব অপরাধমূলক কর্মকান্ড কঠোর হস্তে দমন করা নিরপরাধ লোক যাতে কোনোভাবেই হয়রানির শিকার না হয় তার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১ দল : সব বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে, অস্ত্র কারখানা ও বোমা বানানোর কেন্দ্র ধ্বংস করতে, অস্ত্র-বোমার মজুদ উদ্ধারে, অপরাধী চক্রের ঘাঁটি ও নেটওয়ার্ক নির্মূলে, মাফিয়া-গডফাদারদের দমনে এবং অপরাধী চক্রের দেশী-বিদেশী অর্থ ও শক্তির উৎপাটনে সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা করা হবে। রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী লালন করার ব্যবস্থা উৎপাটিত করা হবে।

প্রশাসন

আওয়ামী লীগ : আধুনিক, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত এবং দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

বিএনপি : প্রশাসন ব্যবস্থায় নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নের মাপকাঠি হবে মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা। রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট : প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনে বর্তমানে দুর্নীতিপূর্ণ আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বদলে সৎ, চরিত্রবান, খোদাভীরু ব্যক্তিদের দ্বারা গণমুখী প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হবে।

জামায়াতে ইসলামী : প্রশাসনের সব পর্যায় থেকে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, প্রভুসুলভ আচরণ, স্বজনপ্রীতি, ঘুষ ও দুর্নীতিকে কঠোরভাবে উচ্ছেদ করার জন্য কার্যকরা ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১১ দল : রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নীতির ভিত্তিতে মৌলিকভাবে ঢেলে সাজানো হবে।

শিক্ষা

আওয়ামী লীগ : সব বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলকে সরকারিকরণসহ দেশের পুরো প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করা হবে। নারী শিক্ষা উৎসাহিত করার জন্য প্রদত্ত উপবৃত্তি অব্যাহত রাখা হবে। ডিগ্রি পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দেয়া হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। কোরান ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না। সব ধর্মের শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

বিএনপি : শিক্ষা ব্যবস্থা আরও আধুনিকীরণ করা হবে। স্কুল পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানিক সুযোগ ও শিক্ষকদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। সব বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল সরকারি করা হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করা হবে। মসজিদ ভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা উৎসাহিত করা হবে।

ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট : সৎ, চরিত্রবান ও দক্ষ নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজানো হবে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষাকে সমন্বিত করা হবে।

১১ দল : সার্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, বৈষম্যহীন, একই ধারার গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য রহিত করা হবে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে অবৈতনিক এবং শিক্ষার ব্যয় হ্রাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া।

শিল্প ও বাণিজ্য

আওয়ামী লীগ : শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হবে। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

হচ্ছে বেতার-টিভির স্বায়ত্তশাসন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। এগুলো যেন প্রতিশ্রুতির জন্য নির্ধারিত বিষয়। ক্ষমতায় গেলে বেতার-টিভির নির্লজ্জ দলীয়করণ দর্শককেও লজ্জায় ফেলে দেয়। আওয়ামী লীগ অবশ্য সরকারি মালিকানাধীন দৈনিক বাংলা ট্রাস্ট বিলুপ্ত করেছে। বন্ধ করেছে সাপ্তাহিক বিচিত্রার প্রকাশনা। পরে শেখ রেহানাকে আওয়ামী লীগ সরকার আপন মনে করে 'বিচিত্রা' নামটি ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। এই ঘটনার পরে বোঝা যায় আওয়ামী লীগ কেন এ বিষয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে এত দ্রুত সক্ষম হয়েছিল। '৯১-এর নির্বাচনের সময় বিএনপি বলেছিল, 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং গণপ্রচার মাধ্যমসমূহকে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।' ক্ষমতায় গিয়ে শুধু দলীয়করণই করা হয়েছিল।

এবারের নির্বাচনকে সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গটি বেশ জোরেসোরেই উচ্চারিত হচ্ছে। আওয়ামী লীগ নিজেকে সব সময়ের মতো মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি বলে ভোট টানতে চেষ্টা করছে। বিএনপিও মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় গঠন করবে বলে অঙ্গীকার করেছে। মজার বিষয় হচ্ছে, জামায়াতে ইসলামীও মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের কথা বলছে তার ইশতেহারে। সেখানে বলা হয়েছে, 'মহলবিশেষের দলীয় সংকীর্ণতার কারণে যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা মানবেতর জীবন যাপন করছেন তাদের সম্মানজনক পুনর্বাসন করা হবে। পঙ্গু ও অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হবে।' জামায়াত যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের টানতে চাচ্ছে ক্ষমতায় যাবার প্রয়োজনে, তেমনি আওয়ামী লীগ-বিএনপিও প্রয়োজনের খাতিরে চিহ্নিত রাজাকার, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ শক্তিকে কোলে বসাতে দ্বিধা করছে না। অতীতেও তা করেনি। আওয়ামী লীগ সরকারে থাকার সময়েই এসএ খালেকের মত প্রতিষ্ঠিত রাজাকারকে নিয়ে টানাটানির জমজমাট নাটক করেছিল। তাদের

বিএনপি : শিল্প ও বাণিজ্য দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ পুঁজি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

জামায়াতে ইসলামী : শিল্প ক্ষেত্রে বিরাজমান বিশৃঙ্খলা দূর করে শিল্পের সম্প্রসারণ, স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। গার্মেন্টস শিল্পের বাজার সংকট দূর করে এর বিকাশে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া। বাণিজ্যনীতিতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও উৎপাদন উপকরণের আমদানির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট : দেশী-বিদেশী শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প নির্মাণে উৎসাহিত করা হবে।

১১ দল : বন্ধ কল-কারখানা চালু করা হবে। শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করা হবে। আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী অর্জিত শ্রমিক অধিকারসমূহ রক্ষা করা হবে। ১৯৬৫ সালের স্ট্যান্ডিং অর্ডার-এর ১৯ (ক) ধারা বাতিল করা হবে।

গ্যাস ও তেল

আওয়ামী লীগ : আগামী ৫০ বছরের জন্য দেশের চাহিদানুযায়ী গ্যাসের মজুদ নিশ্চিত করে উদ্বৃত্ত গ্যাস রপ্তানির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

বিএনপি : প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে শিল্পায়ন ও কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য সব খনিজ পদার্থ থেকে আয় বৃদ্ধির জন্য সর্বাধিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট : গ্যাস সরবরাহ সম্প্রসারণের জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১১ দল : তেল, গ্যাসসহ প্রাকৃতিক সম্পদ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি অসম ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তির ভিত্তিতে বিদেশী বহুজাতিক নিয়ন্ত্রণে তুলে দেয়ার অপচেষ্টা রুখে দাঁড়ানো হবে।

জামায়াতে ইসলামী : প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত আহরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

সংবাদপত্র

আওয়ামী লীগ : বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা হবে। সুস্থ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার বিকাশ, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র শিল্পের ন্যায্য স্বার্থ নিশ্চিত করা হবে।

বিএনপি : অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা হবে। রেডিও টেলিভিশনকে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে।

১১ দল : সংবাদপত্রের বাক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বাতিল করা। গণপ্রচার মাধ্যমসমূহের ওপর জনগণের কার্যকর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং বেতার টিভিকে স্বায়ত্তশাসন দেয়া।

জামায়াতে ইসলামী : রেডিও, টেলিভিশনসহ সব গণমাধ্যম জনগণের চিন্তা-চেতনা ও মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়ক নৈতিকধর্মী অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে।

প্রতিরক্ষা

আওয়ামী লীগ : দেশের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিডিআরের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ, সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে তাদের যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বিএনপি : প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহকে ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে আরও দক্ষ, আধুনিক, সুসজ্জিত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট : দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব জাতীয় নিরাপত্তা বিধানকল্পে সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করা হবে।

জামায়াতে ইসলামী : স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষার লক্ষ্যে আধুনিক সমরাস্ত্র প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিরক্ষাবাহিনী গড়ে তোলা হবে। দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে দেশরক্ষার জিহাদি জজবায় উজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

ধর্মীয় ও জাতিগত সম্প্রদায়

আওয়ামী লীগ : জাতিগত সংখ্যালঘুসহ দেশের সব নাগরিকের ধর্মীয় আচারবিধি পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। দেশের সব নৃজাতি গোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশেষ যত্ন নেয়া।

বিএনপি : জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সংবিধানে প্রদত্ত ধর্মীয় অধিকারসহ সব অধিকার সর্বতোভাবে রক্ষা করা। সব সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন, সম্ভ্রম ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা।

ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট : আদিবাসী জনগণের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ করা হবে।

১১ দল : ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর অত্যাচার, বৈষম্য, হয়রানি বন্ধ। সংখ্যালঘু জাতীয় সত্তাগুলোর স্বকীয়তার পূর্ণাঙ্গ সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান হবে। আদিবাসীদের ওপর হত্যা, খুন, অত্যাচার প্রভৃতি ঘটনার বিচার হবে।

জামায়াতে ইসলামী : দেশের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্মমুক্ত ও স্বাধীনভাবে অনুসরণ এবং পালন করার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সব অংশে বসবাসরত উপজাতীয় ও পশ্চাদপদ ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসহ দেশের সব জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

মন্ত্রিসভার সদস্য ফায়জুল হক, নূরুল ইসলাম রাজাকার হিসেবেই সুপ্রতিষ্ঠিত। শেখ হাসিনার বেয়াই মোশাররফ হোসেন কোন পক্ষের লোক তা নিয়ে খোদ আওয়ামী লীগেও গোপনে কথাবার্তা চলে। আর জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বিএনপি ঐক্যজোট করে ক্ষমতায় আসার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। এই স্বপ্নের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় শেষ পর্যন্ত যে শুধু 'কথার কথা' হবে না তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়।

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সুবিধার জন্য, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতার জন্য প্রয়োজন একটি বেসরকারি পোর্ট। দু'দলই ব্যবসা-বাণিজ্যে সুবিধা দেয়ার কথা বলেন, কিন্তু কারো মেনিফেস্টোতেই বেসরকারি পোর্ট নির্মাণের প্রতিশ্রুতি থাকে না। কারণ এতে ভোটের ওপর প্রভাব পড়তে পারে।

এরকম অসংখ্য 'কথার কথা'তে ভর্তি সবগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহার। অধিকাংশ বিষয়েই দলগুলো বায়বীয়ভাবে বক্তব্য রেখেছে। সুনির্দিষ্টভাবে বলেনি কোন কাজটি কিভাবে করবে তারা। ইশতেহার বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় শুধু জনগণকে বোকা বানিয়ে ভোট আদায়ের জন্য এসব চেষ্টা। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র আদর্শগত ও আচরণগত পার্থক্য থাকলেও মেনিফেস্টোগত বড় কোনো অমিল নেই।

তবে আওয়ামী লীগ এতদিন খুব জোর দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলতো। বিএনপি বা অন্যান্য দলের সঙ্গ কাগজে-কলমে হলেও তাদের একটা পার্থক্য ছিল। এই জায়গা থেকেও আওয়ামী লীগ এবার সরে এসেছে। তারা এখন আর ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছে না। তারাও বলছে 'কোরান ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না। সব ধর্মের শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।'

ইশতেহারে নতুন যেসব সুবিধা দেবে বলে সবগুলো রাজনৈতিক দল অঙ্গীকার করছে তা পূরণে রাষ্ট্রের ব্যয় অনেক বেড়ে

আওয়ামী লীগ যা করেছিল যা করেনি

'৯৬-এর নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ২৯টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সরকার গঠন করে গত ৫ বছরে তার মধ্যে ১টি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ বাস্তবায়ন করেছিল। বাস্তবায়নের ন্যূনতম উদ্যোগ নেয়নি এমন প্রতিশ্রুতি ছিল ১৫টি। এমন প্রতিশ্রুতিগুলো হলো–

১. রাষ্ট্রীয় জীবনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।

২. রাষ্ট্র পরিচালনায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করে একটা দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সুশৃঙ্খল প্রশাসন ব্যবস্থা।

৩. জাতীয় সংসদকে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নের প্রাণকেন্দ্র করা। উন্নয়ন কর্মকান্ডে জাতীয় ঐকমত্যের ওপর গুরুত্বারোপ করা এবং তাতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৪. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে সর্বাত্মক প্রয়াস নেয়া। দলমত নির্বিশেষে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, রাহাজানিসহ সব অপরাধমূলক কর্মকান্ড কঠোর হস্তে দমন।

৫. দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করা। যারা দেশের সম্পদ লুট করেছে, অবৈধ পথে সম্পদ গড়েছে, সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে বা করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬. ভূমি সংস্কার ও ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উপযোগী ও আধুনিক কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা।

৭. দেশজ শিল্পের বিকাশ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি।

৮. শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য শ্রমনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৯. গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

১০. বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান করা।

১১. সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

১২. বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা।

১৩. নারী ও শিশুর উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

১৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করা।

১৫. রেডিও, টেলিভিশন ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থাকে দলীয় প্রভাব মুক্ত রাখা।

আওয়ামী লীগ ৯টি প্রতিশ্রুতি আংশিক বাস্তবায়িত করেছিল। সেগুলো হলো–

১. শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও মান উন্নয়ন। সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ে তোলা।

২. ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ করা।

৩. ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন।

৪. কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য তথা সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা।

৫. নদী খনন, নদী ভাঙনরোধ ও স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ।

৬. বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭. প্রতিটি ইউনিয়নকে থানার সঙ্গে এবং থানাকে জেলার সঙ্গে উন্নত সড়কের মাধ্যমে সংযুক্ত করা।

৮. গঙ্গাসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা।

৯. পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা।

মোটামুটি বাস্তবায়িত হয়েছে ৪টি প্রতিশ্রুতি। সেগুলো হলো–

১. প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সম্মানজনক জীবন ধারণের উপযোগী ব্যবস্থা করা। বেতন কমিশন গঠন।

২. কৃষক ও কৃষিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া এবং আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি প্রবর্তন।

৩. সব ধরনের খেলাধুলার উন্নয়নে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং ক্রীড়ানীতি প্রণয়ন করা।

৪. প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সুসজ্জিত করা।

আওয়ামী লীগ তাদের ইশতেহারে বলেছিল ক্ষমতায় গেলে তারা ভারতের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি নবায়ন করবে না। একমাত্র এই প্রতিশ্রুতিটিই পূর্ণ বাস্তবায়ন করেছে তারা।

যাবে। এই ব্যয়ের জন্য আয় বাড়ানোর কথা কেউই উল্লেখ করেনি। কেননা আয় বাড়াতে হলে ট্যাক্স বাড়াতে হবে। আর তা জনগণের পছন্দ হবে না। এই সত্য অনুধাবন করেই চুপসে গেছে দলগুলো। দুটি দলই সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে চেয়েছে। বর্তমান বিদ্যুৎ ঘাটতি গত দুটি সরকারই যেখানে মেটাতে পারেনি সেখানে এই কথা 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল'-এর মত শোনায়। বিএনপি মোবাইল ফোন চালুর ব্যবস্থা করবে। হয়ত বিএনপি'র লাইনে মোর্শেদ খানের মত কেউ আছেন যিনি সিটি সেলের মত মনোপলি ব্যবসা করতে চাচ্ছেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তেমনটি হয়ত আর সম্ভব হবে না। 'ফাইবার অপটিক সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ইনফরমেশন হাইওয়েতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে'– এই অঙ্গীকার অবশেষে বিএনপি করেছে। বিএনপি নেত্রী হয়ত ভুলে গেছেন দেশের সব তথ্য বিদেশে চলে যাবে এই অজুহাতে তারই সরকার ফাইবার অপটিক পথে বাংলাদেশকে যুক্ত হতে দেয়নি। তখন বিনা খরচে বাংলাদেশ এই সুযোগ

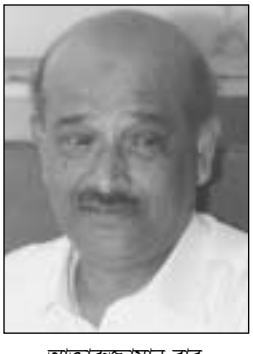

আক্তারুজ্জামান বাবু

কাজী জাফরুল্লাহ

সালমান এফ. রহমান

নূর আলী

এদের দিয়েই কি আওয়ামী লীগ দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন করবে

বিএনপি যা করেছিল যা করেনি

'৯১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বিএনপি ইশতেহার প্রকাশ করেনি। তারা প্রকাশ করেছিল নির্বাচনী ঘোষণা। তবে ক্ষমতাসীন হয়ে সেই নির্বাচনী ঘোষণার এক-তৃতীয়াংশ অঙ্গীকার তারা সম্পূর্ণ পূরণ করেনি। বিএনপি নির্বাচনী ঘোষণার যেসব ধারা বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেয়নি—

১. দুর্নীতিমুক্ত সৎ সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনযন্ত্রকে গতিশীল ও দুর্নীতিমুক্তকরণ।
২. বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা। সর্বপ্রকার কালাকানুন বাতিল করে জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।
৩. গ্রাম সরকার গঠনের লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক ও অর্থনৈতিক যাবতীয় কার্যক্রম গ্রামপর্যায়ে দায়িত্ব পালন করা।
৪. পার্বত্য অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ।
৫. মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান।
৬. মাদ্রাসা শিক্ষাকে সমাজের মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্তকরণে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ।
৭. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সেশনজট রোধ ও যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা।
৮. দেশে বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করে অন্তত মোটা কাপড় সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
৯. শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়ন করা ও সুস্থ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক স্থাপন করা।
১০. ধর্ম, বর্ণ, গ্রোত্র নির্বিশেষে সব নাগরিকের অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণ এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ়করণ
১১. প্রতিটি বিভাগে একটি করে আধুনিক শিশু হাসপাতাল স্থাপন।
১২. দ্রব্যমূল স্থিতিশীল রাখার জন্যে বাস্তবধর্মীপদক্ষেপ গ্রহণ।
১৩. বিলাস সামগ্রী আমদানি সীমিতকরণ ও ক্ষেত্রবিশেষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণ।
১৪. সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে এদেশমুখী করা এবং দেশীয় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতিভা বিকাশে বাংলা একাডেমীর ভূমিকাকে আরও অর্থবহ করা।
১৫. গণপ্রচার মাধ্যমসমূহকে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করা।

নির্বাচনী ঘোষণার যেসব ধারা বিএনপি আংশিক পূরণ করেছে

১. প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সুদক্ষ, সসজ্জিত ও শক্তিশালী করা।
২. প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন।
৩. জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ।
৪. দেশী-বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়ন।
৫.শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ।
৬.নারী সমাজের উন্নয়ন।
৭. শিশু স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি।
৮. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কৃষিখাতকে অগ্রাধিকার।
৯. যমুনা বহুমুখী ও মেঘনা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা।
১০. দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্বিক ব্যবহার করা।
১১. সামঞ্জস্যহীন কোনো শর্তে বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতি।
১২. বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ভূমিকায় সঠিক মূল্যায়ন ও এদেরকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।

পেয়েছিল। বিএনপি'র সেই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে বিশ বছর পিছিয়ে দিয়েছে। আর আওয়ামী লীগ কম্পিউটারকে শুল্কমুক্ত করেছে। অথচ ক্ষমতায় থাকার সময়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে তাদের গাফিলতির কারণে রোগটি বাংলাদেশে চিরস্থায়ী হয়ে গেল।

এম. এ. হাশেম

এস. এ. খালেক

আব্দুল আউয়াল মিন্টু

এদের দিয়েই কি বিএনপি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন করবে

করলেও ফাইবার অপটিক পথে সংযুক্ত হবার বিষয়ে কিছু করতে পারেনি। অভিযোগ আছে, শেখ হাসিনার পুত্র জয় এই ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ার কারণেই বিষয়টি দীর্ঘায়িত হয়।

এইডস, ডেঙ্গু ও অন্যান্য দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ রোধ ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থার বিষয়ে আওয়ামী লীগ উদ্যোগ নেবে বলে ইশতেহারে উল্লেখ

বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলগুলোর শিক্ষকদের ভোট পাবার জন্য দুটো দলই বলেছে সব বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল সরকারি করা হবে। এখানে কত খরচ বাড়বে এবং তা রাষ্ট্র কিভাবে দেবে তা নিয়ে কী কখনো ভেবেছেন নেত্রীরা?

এরকম অসংখ্য সমস্যার সমাধান, প্রতিশ্রুতি তারা দিচ্ছেন ভাবনা চিন্তা না করেই। ইশতেহারগুলো বিশ্লেষণ করলে মনে হয় ঘোষণা করার জন্যই এসব তৈরি করা হয়। ক্ষমতায় গিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার সময়ে এসবের অস্তিত্ব খুঁজে পাবার কথা নয়। তখন নিজেদের মুখের কথা তারা নিজেরাই ভুলে যাবেন।

* * *

একজন তৃষ্ণার্ত পানি চাইলেন ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ এক প্রার্থীর বাসায়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ছোটাছুটি। একজন নিয়ে এলেন ঠান্ডা কোমল পানীয়। গ্রীষ্মের প্রচন্ড গরমে সেই পানীয় প্রাণ ভরে খেলেন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিটি। কৃতজ্ঞতায় আশ্বস্ত করলেন প্রার্থীকে ভোট দেবেন বলে। এভাবে 'ফুস' পানির জোরে জিতে গেলেন প্রার্থীটি। তারপর নির্বাচনের পরে আবার সেই একই লোক গেলেন জয়ী প্রার্থীর বাসায়। এবারও তৃষ্ণা ছিল। তবে এবার আর ফুস পানি পাওয়া গেল না। পানির এই পরিবর্তন দেখে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই সেই প্রার্থীটি বললেন, আরে ঐটা তো নির্বাচনী পানি। নির্বাচন শেষ, ঐসবও শেষ।

এটা বহুল প্রচলিত একটি গল্প। বাংলাদেশে নির্বাচনের সময় নেতা-নেত্রীদের প্রতিশ্রুতির কথা শুনলে আর ক্ষমতায় থাকাকালীন তাদের কার্যকলাপের কথা চিন্তা করলে মনে হয় গল্পটি জীবন থেকেই নেয়া।